بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ নভেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ১৩ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হবে। তবে সর্বপ্রথম আমি একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই। দুই খুতবা পূর্বে হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) সংক্রান্ত আলোচনায় মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের একটি বিবরণ ছিল যাতে প্লেগের কথা বলা হয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, অচিরেই তোমরা সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করবে আর তা তোমাদের হাতে বিজিত হবে। কিন্তু সেখানে ফোঁড়া ও ফুসকুড়ির (মত) একটি রোগ তোমাদের আক্রান্ত করবে যা মানুষকে সিঁড়ির পা হতে ধৃত করবে। এ বাক্যের সঠিক অনুবাদ তুলে ধরা সম্ভব হয় নি, ভুল ছিল এবং এতে (অর্থাৎ যে অনুবাদ করা হয়েছে) তাতে বিষয়টি পরিষ্কারও হয় না। কাজেই এ সম্পর্কে বর্ণনাটি সঠিক অনুবাদসহ বলে দিচ্ছি–

ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করবে। (আর) তা তোমাদের জন্য জয় করা হবে। সেখানে তোমাদের মাঝে এক ধরণের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে যা ফোঁড়া এবং চরম দংশনকারী জিনিসের মত হবে আর তা মানুষের নাভির নিম্নাংশে দেখা দিবে। (পূর্বে) যে বলা হয়েছিল, 'সিড়ির পা হতে ধরবে'– এটি বিভিন্ন শব্দের ভুল অনুবাদ করা হয়েছিল। সঠিক অনুবাদ হল, সেটি মানুষের নাভির নিম্নাংশে দেখা দিবে, যেভাবে নাভির নিম্নাংশে ও পায়ের ওপরের দিকে অর্থাৎ দেহের মধ্যবর্তী অংশে একটি ফোঁড়া বের হয়। তিনি (সা.) বলেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে শাহাদত দান করবেন এবং এর দ্বারা তাদের আমল বা কর্মগুলোকে পবিত্র করবেন। এরপর হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান, মু'আয বিন জাবাল একথা মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছে তাহলে তাকে এবং তার পরিবার পরিজনকে এথেকে পর্যাপ্ত অংশ দান কর। এর ফলে তাদের সবার প্লেগ হয় এমনকি তাদের একজনও প্রাণে রক্ষা পায় নি। তার তর্জনীতে প্লেগের ফোঁড়া বের হলে তিনি (রা.) বলেন, এর পরিবর্তে যদি আমার লাল উটও লাভ হয়, আমি কখনো এতো খুশি হব না। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, মুসনাদ মু'আয বিন জাবাল, হাদীষ নংঃ ২২৪৩৯, বৈরুতের আলেমুল্ কুতুব থেকে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত)**

অতএব এ ছিল (অনুবাদের) সংশোধনী। যে অনুবাদ ছাপা হচ্ছে এবং আল্ ফযলেও ছাপা হয় তাতে পূর্বেই (সংশোধন) করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনাদের সামনেও তুলে ধরি।

এরপর (ধারাবাহিকভাবে) যে স্মৃতিচারণ হচ্ছিল তা হল, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) সংক্রান্ত। এখন সেই স্মৃতিচারণই পুনরায় শুরু হচ্ছে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন অঙ্গচ্ছেদ করা অবস্থায় আমার পিতাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয় অর্থাৎ তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছিল; বিশেষ করে কান ও নাক। তার মরদেহ মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে রাখা হয়। তিনি (রা.)

বলেন, তখন আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরাতে গেলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করে। এরপর লোকেরা এক মহিলার চিৎকারধ্বনি শুনতে পায়; তখন কেউ একজন বলে, ইনি আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)'র কন্যা। তার নাম ছিল হযরত ফাতেমা বিনতে আমর (রা.)। অথবা এটিও বলা হয়, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)'র বোন ছিলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, কেঁদো না, কেননা ফিরিশ্তারা তাদের ডানা প্রসারিত করে তার ওপর লাগাতার ছায়া করে রেখেছে। **(আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতি আল্ আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫৪-৯৫৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, বৈরুতের দারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের দিন যখন আমার পিতার (মরদেহ) নিয়ে আসা হয় তখন আমার ফুফু তার জন্য কাঁদতে থাকেন আর আমিও কান্না জুড়ে দেই। লোকেরা আমাকে বারণ করতে থাকে কিন্তু মহানবী (সা.) আমাকে নিষেধ করেন নি। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা তার জন্য ক্রন্দন কর বা না কর, আল্লাহ্র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাকে সমাহিত করছ, ফিরিশ্তারা ডানা দিয়ে তার ওপর লাগাতার ছায়া করে রেখেছিল। **(আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতি আল্ আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫৬, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, বৈরুতের দারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)**

উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, (এ সম্পর্কে) অনেক মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। সহীহ্ বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদদের মধ্য থেকে দু'জন দু'জন করে একই কাফনে আবৃত করতেন আর জিজ্ঞেস করতেন, এদের মধ্যে কে কুরআন বেশি জানতো? যখন তাদের কোন একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হতো তখন মহানবী (সা.) তাকে প্রথমে লেহদে রাখতেন বা কবরস্থ করতেন এবং বলতেন, আমি কিয়ামত দিবসে এসব লোকের পক্ষে সাক্ষী হব আর তাদেরকে রক্তমাখা অবস্থায়ই দাফন করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে গোসলও করানো হয় নি আর তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয় নি। **(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাব আস্সালাতু আলাশ্ শহীদ, হাদীস নংঃ ১৩৪৩)**

সহীহ্ বুখারীতে আরো একটি হাদীস রয়েছে। (আমি যেটি পড়েছি সেটিও বুখারীর হাদীস।) যাতে হযরত উকবাহ্ বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদিন এসে উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন। বুখারীর অপর একটি হাদীসে রয়েছে, উহুদের যুদ্ধের ৮ বছর পর মহানবী (সা.) উহুদের শহীদদের জানাযা পড়েছেন। **(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাব আস্সালাতু আলাশ্ শহীদ, হাদীস নংঃ ১৩৪৪), (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল মাগাযী, বাব গযওয়াতুল উহুদ, হদীস নংঃ ৪০৪২)**

সুনান ইবনে মাজা'য় বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের শহীদদেরকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে আনা হলে তিনি (সা.) দশজন করে সাহাবীর জানাযা (একত্রে) পড়াতেন। হযরত হামযাহ্ (রা.)'র মরদেহ তাঁর কাছেই থাকতো কিন্তু অন্য শহীদদের সরিয়ে নেয়া হতো। **(সুনান ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল জানায়েয, মা জায়া ফিস্ সালাতী আলাশ্ শুহাদায়ে ওয়া দাফনিহিম, হাদীস নংঃ ১৫১৩)**

সুনান আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের শহীদদের গোসল দেওয়া হয় নি এবং তাদের রক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহেই তাদের সমাহিত করা হয় আর তাদের কারোই জানাযা পড়া হয় নি। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, বাব ফিশ্ শহীদি ইউগসাল, হাদীস নংঃ ৩১৩৫)**

সুনান আবু দাউদেরই অপর একি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত হামযাহ্ (রা.) ছাড়া অন্য কোন শহীদের জানাযা পড়েন নি। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, বাব ফিশ্ শহীদি ইউগসাল, হাদীস নং: ৩১৩৭)**

সুনান তিরমিযীর হাদীসে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন নি। **(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুল জানায়েয, বাব মা জায়া ফি কাতলা উহুদ ওয়া যিকরি হামযাহ্, হাদীস নং: ১০১৬)**

'সীরাত ইবনে হিশাম' এবং 'সীরাত হালবিয়া'তে লেখা আছে, মহানবী (সা.) উহুদের শহীদদের জানাযা যেভাবে পড়েছেন তা হল, সর্বপ্রথম হযরত হামযাহ্ (রা.)'র জানাযার নামায পড়েন। তিনি (সা.) জানাযার নামাযে সাত তকবীর দেন। 'সীরাত হালবিয়া' অনুসারে {মহানবী (সা.)} চার তকবীরে জানাযা পড়ান। এরপর অন্যান্য শহীদদের একে একে আনা হতো আর হযরত হামযাহ্ (রা.)'র পবিত্র মরদেহের পাশে রাখা হতো এবং তিনি (সা.) উভয়ের জানাযার নামায পড়তেন আর এভাবে সকল শহীদের জানাযার নামায একবার এবং হযরত হামযাহ্ (রা.)'র জানাযার নামায ৭২ বার আর কারো কারো মতে ৯২ বার পড়া হয়। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৯৫-৩৯৬, গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত), (আস্সিরাতুল হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৭, বাব যিকরু মাগাযীহি, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

একটি জীবনীগ্রন্থ **'দালায়েলুন্ নবুয়্যাহ্'**তে লেখা আছে, হযরত হামযাহ্ (রা.)'র মরদেহের পাশে নয়জন শহীদকে একসাথে আনা হতো এবং তাদের জানাযার নামায পড়া হতো। এরপর এই নয়জনকে সরিয়ে নেয়া হতো, তারপর আরো নয়জনকে আনা হতো; এভাবে সকল শহীদের জানাযার নামায পড়া হয়। জানাযার নামাযে প্রত্যেকবারই তিনি (সা.) ৭ বার তকবীর দেন। **(দালায়েলুন্ নবুয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭, ইজাদুল হারব ওয়ামা যাহারা মিনাল আসারি ফী হালিশ্ শুহাদায়ে, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

'সীরাতে হালবিয়া' ও 'দালায়েলুন্ নবুয়্যাহ্'তে উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযার নামায সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রা.)'র বর্ণনা হল, 'মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদেরকে রক্তমাখা অবস্থায় সমাহিত করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে গোসলও দেওয়া হয় নি আর জানাযাও পড়া হয় নি'– উভয় পুস্তকে এই বর্ণনাকে অধিক দৃঢ় বা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। **(আস্সিরাতুল হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৮, বাব যিকরু মাগাযীহি, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), (দালায়েলুন্ নবুয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭-২৮৮, ইজাদুল হারব ওয়ামা যাহারা মিনাল আসারি ফী হালিশ্ শুহাদায়ে, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাব আস্সালাতু আলাশ্ শহীদ, হাদীস নং: ১৩৪৩)**

হযরত ইমাম শাফী' (রহ.) বলেন, উপর্যুপরি বর্ণনার মাধ্যমে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহানবী (স.) উহুদের যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়েন নি। আর যেসব রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, তিনি (সা.) সকল শহীদের জানাযা পড়েছিলেন এবং হযরত হামযাহ্ (রা.)'র জন্য ৭০বার তকবীর বলেছিলেন– এ কথা সঠিক নয়। এছাড়া হযরত উকবাহ্ বিন আমের (রা.)'র বর্ণনার যতটুকু সম্পর্ক অর্থাৎ, মহানবী (সা.) ৮ বছর পর শহীদদের জানাযা পড়েছেন; এ রেওয়ায়েতে এটি উল্লেখ রয়েছে যে, এটি ৮ বছর পরের ঘটনা। **(আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী প্রণীত ফাতহুল বারী, শরাহ্ সহীহ্ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯, কায়রোর দারুর্ রাইয়্যান লিত্ তারাস থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত)**

যেমনটি আমি বলেছি, এ সম্পর্কে অনেক বিতর্ক হয়েছে, এখানে আরো কিছু (হাদীস) তুলে ধরছি।

ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর পুস্তকে 'বাবুস্ সালাতে আলাশ্ শহীদ' অর্থাৎ হাদীসের শিরোনাম দিয়েছেন 'শহীদদের জানাযার নামায' এবং এর অধীনে শুধু দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। আর এতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, উহুদের যুদ্ধের শহীদদের গোসলও দেয়া হয় নি আর তাদের জানাযার নামাযও পড়া হয় নি। পক্ষান্তরে অপর হাদীসে হযরত উকবাহ্ বিন আমের (রা.)'র বরাতে বর্ণিত হয়েছে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ অর্থাৎ একদিন মহানবী (সা.) বের হন এবং উহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের আদলে নামায পড়েন। এ হাদীসটিই বুখারীতে অন্যত্র 'গযওয়ায়ে উহুদ' অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধ অধ্যায়েও রয়েছে। সেখানে এই সাহাবীই বর্ণনা করেন, صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ অর্থাৎ, মহানবী (সা.) উহুদের শহীদদের জন্য ৮ বছর পর এমনভাবে নামায পড়েন যেভাবে জীবিত বা মৃতদের বিদায় জানানো হয়। **(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাব আস্সালাতু আলাশ্ শহীদ, হাদীস নং: ১৩৪৩-১৩৪৪), (সহীহ্ বুখারী কিতাবুল মাগাযী, বাব গযওয়ায়ে উহুদ, হদীস নং: ৪০৪২)**

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফী' (রহ.)'র একথার অর্থ হল, কারো মৃত্যুর পর দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হলে তার সমাধিতে জানাযা পড়া হয় না। ইমাম শাফী (রহ.)'র মতে মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন, তাঁর নিজের মৃত্যুর সময় সন্নিকট, তখন তিনি সেসব শহীদের কবরে গিয়ে তাদেরকে বিদায় জানিয়ে তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। **(আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী প্রণীত ফাতহুল বারী, শরাহ্ সহীহ্ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯, কায়রোর দারুর্ রাইয়্যান লিত্ তারাস থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত)**

উহুদের শহীদদের কাফন-দাফনের উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

"লাশগুলো একত্রিত করার পর কাফন-দাফনের কাজ আরম্ভ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, শহীদদের দেহে যে কাপড়-চোপড় রয়েছে তা সেভাবেই থাকবে আর শহীদদের যেন গোসল দেয়া না হয়। অবশ্য কারো কাছে যদি কাফনের জন্য অতিরিক্ত কাপড় থাকে তবে তা পরিধানের কাপড়ের ওপর যেন পেঁচিয়ে দেয়া হয়। জানাযার নামাযও তখন পড়া হয় নি। অতএব গোসল ও জানাযা ছাড়াই শহীদদের সমাহিত করা হয়। সাধারণত একটি কাপড়ে দু'জন সাহাবীকে আবৃত করে একই কবরে একত্রে সমাহিত করা হয়। যে সাহাবী কুরআন শরীফ বেশি জানতেন তাকে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে কবরে নামানোর সময়ে প্রাধান্য দেয়া হতো।" তিনি (রা.) আরো লিখেছেন, "যদিও তখন জানাযার নামায পড়া হয় নি কিন্তু পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে বিশেষভাবে উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়েন"। তিনি (রা.) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যমূলে এটি প্রমাণ করেন। হয়ত নামায পড়া হয়েছে বা দোয়া করা হয়েছে। মোটকথা খুবই বিগলিত চিত্তে তাদের জানাযার নামায পড়েন। "আর অনেক আবেগ নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করেন।" **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃ: ৫০১-৫০২}**

হতে পারে (তাদের জন্য) দোয়া করেছেন যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকের সমাধিতে গিয়ে দোয়া করে থাকবেন এবং একান্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে তাদের জন্য দোয়া করেছেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতার জন্য উহুদের যুদ্ধের ছয় মাস পর কবর প্রস্তুত করি এবং তাকে তাতে সমাহিত করি। তখন আমি তার

দেহে কোন পরিবর্তন দেখতে পাইনি, কেবলমাত্র তার কয়েকটি দাড়ি ব্যতিরেকে, যেগুলো মাটির সাথে লেগে ছিল। **(উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধের সময় এক কবরে দু'জনকে সমাহিত করা হয় আর আমার পিতার সাথেও একজন সাহাবীকে দাফন করা হয়। ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমার মন তাকে একটি পৃথক কবরে দাফন করতে চায়। অতএব আমি তাকে কবর থেকে বের করলে দেখি, মাটি তার দেহে কোন পরিবর্তন সাধন করে নি, শুধুমাত্র কানের মাংসপেশীর সামান্য পরিবর্তন ছাড়া। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

উহুদের যুদ্ধের ৪৬ বছর পর হযরত আমীর মুআবিয়াহ্ নিজ শাসনামলে খাল খনন করান যার পানি উহুদের শহীদদের কবরে ঢুকে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) এবং হযরত আমর বিন জমূহ্ (রা.)'র কবরেও পানি প্রবেশ করে। যখন তাদের কবর খোঁড়া হয়, তখন (দেখা যায়) তাদের ওপর দু'টি চাদর পড়ে ছিল। এছাড়া এই রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বলেন, তাদের চেহারায় ক্ষত ছিল আর তার হাত ছিল ক্ষতের ওপর। এরপর যে বর্ণনা রয়েছে তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। আমি যদিও সেটি বর্ণনা করছি কিন্তু তা নির্ভরযোগ্য হওয়া অবশ্যক নয়। এটি যেহেতু কতিপয় ইতিহাসগ্রন্থে লিখিত আছে আর কোন কোন পাঠক তা অধ্যয়নও করে থাকে তাই এখানে বর্ণনার উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, হতে পারে এতে কিছুটা অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। যাহোক তিনি বলেন, ক্ষতের ওপর থেকে যখন হাত সরানো হয় তখন সেই ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, (যা অসম্ভব।) তার হাত পুনরায় ক্ষতস্থানে রেখে দেয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিছু এমন বিবরণও মাঝে এসে যায় যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি কবরে (শায়িত) আমার পিতার দিকে তাকালে মনে হচ্ছিল যেন তিনি ঘুমাচ্ছেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৪, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (কিতাবুল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত)**

অথচ তিনি বলেন, ছয় মাস পর যখন তিনি (কবর থেকে তাকে) বের করেছিলেন তখনও মাংসপেশী কিছুটা বদলে গিয়েছিল। তাই ৪৬ বছর পর (মরদেহে) কোন প্রভাব পড়ে নি আর (কেবল) হাড়গোড় অবশিষ্ট থাকে নি তা হতেই পারে না। (তার) মরদেহে কোন পরিবর্তন আসে নি– এমনটি হতেই পারে না; কারণ এটি প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার সাথে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, হে জাবের! আমি তোমাকে বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি, (এর) কারণ কী? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন কিন্তু তিনি ঋণ ও সন্তানাদি রেখে গেছেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে সে অবস্থার সুসংবাদ দিব না যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা তোমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অবশ্যই। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পর্দার অন্তরাল করা ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন নি। অর্থাৎ যার সাথেই আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকেই বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতাকে আল্লাহ্ তা'লা জীবিত করেছেন আর এরপর তার সাথে সামনাসামনি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, **"হে আমার বান্দা! আমার কাছে চাও যেন আমি তোমাকে দিতে পারি। তিনি নিবেদন করেন, হে আমার**

প্রভু! আমাকে পুনরায় জীবিত করো যেন আমি তোমার পথে আবার নিহত হতে পারি।" অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিবেদন করেন, **"হে আমার প্রভু! আমি তোমার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করি নি। আমার বাসনা হল, তুমি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ কর যেন আমি তোমার নবী (সা.)-এর সঙ্গী হয়ে তোমার পথে লড়াই করতে পারি এবং তোমার পথে পুনরায় নিহত হতে পরি। তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছি যে, যে ব্যক্তি একবার মৃত্যু বরণ করে তাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত করা হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিবেদন করেন, হে আমার প্রভু! আমার পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের কাছে এ কথা পৌঁছে দাও।"** এ উপলক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (সূরা আলে ইমরান: ১৭০) অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মোটেই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাদেরকে তাদের প্রভুর সন্নিধানে রিয্‌ক সরবরাহ করা হচ্ছে। (সুনান তিরমিযী, আবওয়াবু তফসীরুল কুরআন, বাব তফসীর সূরা আলে ইমরান, হাদীস নং: ৩০১০), **(দালায়েলুন্ নবুয়্যাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮, ইজাদুল হারব ওয়ামা যাহারা মিনাল আসারি ফী হালিশ্ শুহাদায়ে, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতি আল্ আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫৫-৯৫৬, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর, বৈরুতের দারুল্ জীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত)**

এই আয়াতটি পূর্বেও আমি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)'র প্রেক্ষিতে বর্ণনা করেছি। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)'র সাথে আল্লাহ্ তা'লার সংলাপ-সংক্রান্ত এই ঘটনাটির বিশদ বিবরণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খিলাফতের পূর্বেকার এক বক্তৃতায় এভাবে তুলে ধরেছেন যে,

"এই ঘটনাটি বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য ও আকর্ষণে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, এটি এক নতুন সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এটি থেকে আমরা এ-ও জানতে পারি, নিজ প্রভুর সাথে মহানবী (সা.)-এর কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ছিল! {তিনি (সা.)}বান্দাদের প্রতিও স্নেহপ্রবণ ছিলেন আবার স্বীয় প্রভুর মাঝেও অবগাহণ করছিলেন! একটি দিক নিজ সাহাবীদের প্রতি ঝুঁকে ছিল আর আরেকটি দিক পরম বন্ধুর সাথে সদা সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত ছিল! সেই সত্তা, যিনি শান্তির সময় ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ [অতঃপর সে {মুহাম্মদ (সা.)} নিকটবর্তী হল এবং তিনি (আল্লাহ্)-ও তাঁর দিকে নেমে আসেন। (সূরা আন্ নজম: ৯)]-এর সর্বোচ্চ দিগন্তে সমাসীন ছিল, যুদ্ধাবস্থায়ও এক নিমিষের তরে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। একটি চোখ রণক্ষেত্রের ওপর ছিল অপরটি ছিল পরম প্রিয়ের সৌন্দর্য অবলোকনে মত্ত; এক কান মমতার সাথে সাহাবীদের প্রতি উৎকর্ণ থাকলে অপরটি ছিল ঊর্ধ্বলোকের প্রতি নিজ প্রভুর সুমিষ্ট বাণী শ্রবণে রত; **হাত কাজে ব্যস্ত, কিন্তু হৃদয় পরম বন্ধুর স্মরণে রত**! একদিকে তিনি (সা.) সাহাবীদের মনস্তুষ্টি করছিলেন, অপরদিকে খোদা তাঁর মনস্তুষ্টি করছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)'র হৃদয়ের অবস্থার সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা তাকে (সা.) এই সংবাদ দিচ্ছিলেন যে, হে আমার প্রতি সবচেয়ে অনুরক্ত ব্যক্তি, দেখ! তোমার ভালোবাসায় আমার তত্ত্বজ্ঞানী বান্দাদের হৃদয় কীভাবে পূর্ণ করে দিয়েছি যে, নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পরও তোমার চিন্তা তাদের উদ্বেলিত করতে থাকে; আর তোমাকে রণক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করার কারণে তারা কতই না মর্মপীড়ার শিকার! তোমার বিপরীতে জান্নাতের কোন লোভ তাদের নেই!

বারংবার তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হলেও তাদের জান্নাত হল, তোমার সাহচর্য, তোমার সঙ্গ লাভ এবং তোমার সাথে থাকতে পারা।" **{খুতবাতে তাহের (তাকারীর জলসা সালানা কবল আয খিলাফত) তকরীর জলসা সালানা, ১৯৭৯, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০}**

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন, তখন তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। পাওনাদারদের বুঝিয়ে তার ঋণ কিছুটা হ্রাস করে দেয়ার জন্য আমি মহানবী (সা.)-এর সাহায্য চাই। মহানবী (সা.) তাদের কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, কিন্তু তারা ছাড় দেয় নি। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, যাও, তোমার প্রত্যেক প্রকার খেজুর পৃথক পৃথক রাখ; আজওয়াহ্ খেজুর পৃথক রাখবে এবং ইযক বিন যায়েদ খেজুর পৃথক রাখবে; এরপর আমাকে সংবাদ পাঠাবে। অতঃপর আমি এমনটিই করি এবং মহানবী (সা.)-কে আসার জন্য বার্তা পাঠাই। তিনি (সা.) এসে খেজুরের স্তুপের ওপর বা সেগুলোর মাঝে আসন গ্রহণ করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে (অর্থাৎ পাওনাদারদের) মেপে মেপে দাও। অতএব, আমি তাদেরকে মেপে মেপে দিতে থাকি; এক পর্যায়ে তাদের পাওনা আমি সম্পূর্ণ পরিশোধ করি, তারপরও আমার খেজুর উদ্বৃত্ত রয়ে যায়। এমন মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো একটুও কমে নি। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ' বাব আলকাইলু আলাল বাইয়ে ওয়াল মু'তী, হাদীস নংঃ ২১২৭)**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে নিজের পুত্র জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) ছাড়াও ছয়জন কন্যা রেখে গিয়েছিলেন। সহীহ্ বুখারীর এক বর্ণনা অনুসারে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে সাতজন বা নয়জন কন্যা রেখে গিয়েছিলেন। **(সুনান নেসাঈ কিতাবুল ওয়াসায়া, বাব আল্ ওসীয়্যাতু বিস্সুলুস, হাদীস নংঃ ৩৬৬৬), (বুখারী কিতাবুন্ নাফাকাত, বাব অওনুল্ মারআতি যওজাহা ফি ওয়ালাদিহি, হাদীস নংঃ ৫৩৬৭)**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল, হযরত আবু দুজানাহ্ সিমাক বিন খারাশা (রা.)। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সায়েদাহ্র সদস্য ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খারাশাহ্; কেউ কেউ বলে তার পিতার নাম ছিল অওস এবং দাদার নাম ছিল খারাশাহ্। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র মায়ের নাম ছিল হাযমাহ্ বিনতে হারমালাহ্। তিনি তার আসল নামের চেয়ে আবু দুজানাহ্ ডাকনামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র এক পুত্র ছিল, যার নাম ছিল খালেদ আর তার মায়ের নাম ছিল আমেনা বিনতে আমর। **(উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৯, আবু দুজানাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রা.) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মহানবী (সা.) তার ও হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০, আবু দুজানাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) বদর ও উহুদসহ অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। **(উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) আনসারদের জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর (জীবদ্দশায় সংঘটিত) যুদ্ধসমূহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। **(আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতিল্ আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত)**

যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) পরম বীরত্ব প্রদর্শন করতেন আর তিনি খুবই দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন। তার একটি লাল রঙের রুমাল ছিল যা কেবল যুদ্ধের সময়ই তিনি মাথায় বাঁধতেন। তিনি যখন সেই লাল রুমাল মাথায় বাঁধতেন তখন মানুষ বুঝতে পারতো যে, এখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) সাহসী এবং বীর পুরুষদের মাঝে পরিগণ্য হতেন। **(উসদুল গাবাহ্ ফি মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৬, আবু দুজানাহ্ সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)-কে যুদ্ধক্ষেত্রে তার লাল পাগড়ির কারণে চেনা যেত এবং বদরের যুদ্ধেও এটি তার মাথায় ছিল। আর মুহাম্মদ বিন উমর বলেন, হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) উহুদের যুদ্ধেও এভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন আর (যুদ্ধক্ষেত্রে) মহানবী (সা.)-এর সাথে অবিচল ছিলেন আর মৃত্যুর শর্তে তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করেছিলেন। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০, আবু দুজানাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) এবং হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) পরম বীরত্বের সাথে (আক্রমনকারীদের হাত থেকে) মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করেন। সেদিন হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) গুরুতর আহত হয়েছিলেন আর হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) শাহাদত বরণ করেন। **(আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতিল্ আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯, আবু দুজানাহ্ আনসারী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, উহুদের দিন মহানবী (সা.) একটি তরবারি হাতে নেন এবং বলেন, من يأخذ مني هذا؟ অর্থাৎ, আমার কাছ থেকে এটি কে নিবে? সবাই তখন নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে বলে, আমি নিতে চাই, আমি। মহানবী (সা.) পুনরায় বলেন, فمن يأخذه بحقه؟ অর্থাৎ, কে এটির প্রতি সুবিচারের শর্তে গ্রহণ করতে চায়? হযরত আনাস (রা.) বলেন, একথা শুনে সবাই থেমে যায়। তখন হযরত সিমাক বিন খারাশা আবু দুজানাহ্ (রা.) বলেন, আমি এটির যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে এটি গ্রহণ করছি। হযরত আনাস (রা.) বলেন, এরপর তিনি এই তরবারি গ্রহণ করেন এবং মুশরিকদের মস্তক কর্তন করেন। এটি মুসলিম শরীফের হাদীস। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলিস্ সাহাবাহ্, বাব মিন ফাযায়েল আবী দুজানাহ্ সিমাক বিন খারাশাহ্, হাদীস নংঃ ৬৩৫৩)**

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এটির যথার্থ অধিকার প্রদান বলতে কী বুঝায়? তখন মহানবী (সা.) বলেন, এর মাধ্যমে কোন মুসলমানকে হত্যা করবে না এবং এটি (হাতে) থাকতে কোন কাফিরের ভয়ে পলায়ন করবে না, অর্থাৎ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে। একথা শুনে হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) বলেন, আমি এর প্রতি সুবিচারের শর্তে এই তরবারি গ্রহণ করছি। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু দুজানাহ্কে উক্ত তরবারি প্রদান করেন তখন তিনি তা দিয়ে মুশরিকদের মুণ্ডুপাত করেন। সে সময় তিনি এই পংক্তিগুলো পড়ছিলেন-

انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل

الا أقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول

অর্থ: আমি সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে আমার বন্ধু অঙ্গীকার নিয়েছেন, যখন কিনা আমরা সাফাহ্ নামক স্থানে খেজুর বৃক্ষের নিকটে ছিলাম। আর সেই অঙ্গীকার হল, আমি সৈন্যবাহিনীর পিছনের সারিতে দাঁড়াব না এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর তরবারি

দিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবো। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) অহংকারপূর্ণ চলনভঙ্গিতে সেনাবাহিনীর সারিগুলোর মাঝে বিচরণ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) বলেন,

إنّ هذه مشيّة يبغضها الله عزّ وجلّ إلّا في هذا المقام

অর্থ: এটি এমন চলার ভঙ্গি যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট অপছন্দনীয়, কেবল এ স্থান ব্যতীত, অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া। **(আল্ ইসাবাহ্ ফী তমীযিস্ সাহাবাহ্, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১০০, আবু দুজানাহ্ আল্ আনসারী, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত), (উসদুল গাবাহ্ ফি মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধের দিন একটি তরবারি উপস্থাপন করে বলেন, من يأخذ هذا السيف بحقه অর্থাৎ, কে আছে যে এই তরবারিকে এর প্রতি সুবিচারের শর্তে গ্রহণ করবে? হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বলি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি। মহানবী (সা.) আমাকে উপেক্ষা করেন। মহানবী (সা.) পুনরায় জিজ্ঞাস করেন, কে আছে যে এই তরবারিকে এর যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে গ্রহণ করবে? আমি পুনরায় নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি। মহানবী (সা.) আবারও আমাকে উপেক্ষা করেন। তিনি (সা.) আবারও বলেন, কে আছে যে এই তরবারিকে এর যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে গ্রহণ করবে? হযরত আবু দুজানাহ্ সিমাক বিন খারাশাহ্ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি এই তরবারিকে এর যথার্থ অধিকার প্রদানের শর্তে গ্রহণ করছি, আর এর যথার্থ অধিকার কী? তিনি (সা.) বলেন, এর দ্বারা কোন মুসলমানকে হত্যা করবে না, এটি থাকতে কোন কাফিরের ভয়ে পলায়ন করবে না, বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, এরপর মহানবী (সা.) আবু দুজানাহ্ (রা.)-কে তরবারিটি প্রদান করেন। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র অভ্যাস ছিল, যখন তিনি যুদ্ধের সংকল্প করতেন তখন নিজের মাথায় লাল রুমাল বেঁধে নিতেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম আজ আমি দেখব, তিনি কীভাবে এই তরবারির যথার্থ অধিকার প্রদান করেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আবু দুজানাহ্ (রা.)'র সামনে যে-ই আসতো তিনি তাকে হত্যা করতেন আর কচুকাটা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, এমনকি তিনি (শত্রু) সৈন্যদের সারি ভেদ করে তাদের মহিলাদের কাছে পৌঁছে যান, যারা পাহাড়ের পাদদেশে ঢোল বাজাচ্ছিল আর তাদের মধ্যে একজন মহিলা কবিতার একটি পঙক্তি পড়ছিল, যার অর্থ হচ্ছে-

আমরা তারেক অর্থাৎ প্রভাত-নক্ষত্রের কন্যা, যারা মেঘমালায় ভেসে বেড়ায়, যদি তোমরা সামনে এগিয়ে যাও তবে আমরা তোমাদের আলিঙ্গন করব আর তোমাদের উপবেশনের জন্য বালিশ বিছিয়ে দেবো। কিন্তু তোমরা যদি (রণক্ষেত্রে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তবে আমরা তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। এটি এমন বিচ্ছেদ হবে যে, এরপর আমাদের ও তোমাদের মাঝে ভালোবাসার আর কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকবে না।

হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি লক্ষ্য করি যে, আবু দুজানাহ্ (রা.) একজন মহিলাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তরবারি উঠান কিন্তু আবার থেমে যান। যুদ্ধ শেষে আমি তাকে বলি, আমি আপনার সমস্ত রণনৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি। আপনি একজন মহিলার ওপর তরবারি উচিয়ে আবার নামিয়ে নিয়েছেন– এর কারণ কী ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি কোন নারীকে হত্যা করা থেকে বিরত থেকে মহানবী (সা.)-এর তরবারির সম্মান করেছি। আমি কোন নারীকে হত্যার জন্য মহানবী (সা.)-এর তরবারি ব্যবহার করব,

তা অসম্ভব; তাই আমি বিরত থাকি। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, সেই মহিলা ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা; যে অন্যান্য মহিলার সাথে একত্রে রণসঙ্গীত পরিবেশন করছিল। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) তার ওপর যখন তরবারি উঁচু করেন তখন সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে বলে–হে সাখার! কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) তাঁর তরবারি নিচে নামিয়ে নেন এবং ফিরে যান। হযরত যুবায়ের (রা.) জানতে চাইলে তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর তরবারি দিয়ে কোন অসহায় মহিলাকে হত্যা করাকে আমি পছন্দ করি নি। **(আল্ মুসতাদরাক আলাস্ সহীহাঈন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪০-৪৪১, কিতাব মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্ যিকরু মানাকেব আবী দুজানাহ্, রেওয়ায়েত নাম্বার: ৫০৮৮, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত), (শরাহ্ আল্লামা যারকানী আলাল্ মওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪০৬-৪০৭, কিতাবুল মাগাযী, বাব গযওয়াতি উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র উক্ত ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, সম্মুখ সমরে কাফির কুরাইশদের পরাজয় বরণ হতে হয়। এই দৃশ্য অবলোকন করে কাফিররা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে (মুসলমানদের ওপর) গণহামলা চালায়। মুসলমানরাও নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করে সামনে এগিয়ে যায় আর উভয় সেনাদল পরস্পর তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খুব সম্ভব তখনই মহানবী (সা.) নিজ তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এই তরবারি নিয়ে এর প্রতি সুবিচার করবে? গৌরবের আকাঙ্ক্ষায় অনেক সাহাবী নিজেদের হাত বাড়িয়ে দেন, যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) বরং কোন কোন বর্ণনানুসারে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) নিজের হাত গুটিয়ে রাখেন এবং এটিই বলতে থাকেন যে, এই তরবারির প্রতি সুবিচার করবে এমন কেউ আছে কি? পরিশেষে হযরত আবু দুজানাহ্ আনসারী (রা.) নিজের হাত বাড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! অনুগ্রহ করে আমাকে দিন। তিনি (সা.) এই তরবারি তাকে দিয়ে দেন আর আবু দুজানাহ্ (রা.) তা হাতে নিয়ে সদম্ভে ও অহংকারের সাথে কাফিরদের দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন চলনভঙ্গি অপছন্দ করেন তবে এমন ক্ষেত্রে নয়। যুবায়ের (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর তরবারি লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন আর নিকটাত্মীয় হবার সুবাদে তার অধিকারও সবচেয়ে বেশি বলে মনে করতেন, অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেন যে, ঘটনা কী? মহানবী (সা.) আমাকে ঐ তরবারি কেন দিলেন না অথচ আবু দুজানাহ্কে দিলেন? নিজের এই দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য মনে মনে সংকল্প করেন যে, আমি যুদ্ধের ময়দানে আবু দুজানাহ্র সাথে সাথে থাকবো আর দেখবো যে, তিনি এই তরবারি দিয়ে কী করেন। মোটকথা তিনি বলেন, আবু দুজানাহ্ নিজের মাথায় এক টুকরো লাল কাপড় বাঁধেন আর সেই তরবারি নিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসাগীত গাইতে গাইতে মুশরিকদের সারিতে ঢুকে পড়েন আর আমি লক্ষ্য করি, যেদিকেই যাচ্ছিলেন, সেদিকেই মৃত্যুর মিছিল চলছিল আর আমি এমন কাউকে দেখি নি যে তার সামনে এসেছে আর প্রাণে বেঁচে গেছে। এমনকি তিনি কুরাইশ সেনাদলের মাঝে নিজের পথ বানিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে যান যেখানে কুরাইশদের মহিলারা দাঁড়িয়ে ছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা- যে কিনা নিজেদের পুরুষদেরকে হিংস্রভাবে (যুদ্ধের জন্য) উজ্জীবিত ও উত্তেজিত করছিল, সে তার সামনে আসে। আবু দুজানাহ্ (রা.) তার ওপর স্বীয় তরবারি উঠালে হিন্দা গগনবিদারী কণ্ঠে চিৎকার করে আর নিজেদের পুরুষদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে কিন্তু কেউ তার সাহায্যে আসে নি। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি দেখি, আবু দুজানাহ্ (রা.) স্বয়ং নিজ তরবারি নামিয়ে

ফেলেন আর সেখান থেকে সরে যান। যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তখন আবু দুজানাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, ঘটনা কী? প্রথমে আপনি তরবারি উঠিয়ে আবার তা নামিয়ে ফেললেন? তিনি বলেন, আমার মন সায় দেয় নি যে, মহানবী (সা.)-এর তরবারি দিয়ে এক মহিলাকে আঘাত করব আর মহিলাও এমন যার সাথে তখন কোন সুরক্ষাকারী পুরুষও উপস্থিত নেই। যুবায়ের (রা.) বলেন, তখন আমি বুঝতে পারি, মহানবী (সা.)-এর তরবারির প্রতি আবু দুজানাহ্ (রা.) যেভাবে সুবিচার করেছে, আমি হয়তো তা করতে পারতাম না। এরফলে আমার মনের অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৮৯-৪৯০}**

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) একটি তরবারি দিয়ে বলেন, আমি এই তরবারি তাকেই দিব- যে এর প্রতি সুবিচারের প্রতিশ্রুতি দিবে। অনেকেই সেই তরবারি গ্রহণে আগ্রহ দেখান। তিনি (সা.) আবু দুজানাহ্ আনসারী (রা.)-কে সেই তরবারি প্রদান করেন। যুদ্ধক্ষেত্রের এক জায়গায় মক্কাবাসীদের কিছু সৈন্য আবু দুজানাহ্ (রা.)'র ওপর আক্রমন করে। তিনি যখন তাদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তখন দেখেন, একজন সৈন্য তাদের মাঝে সর্বোচ্চ উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করছে। তিনি (রা.) তরবারি উচিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার কাছে যান কিন্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন। অর্থাৎ, হযরত দুজানাহ্ তরবারি নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু পরক্ষণেই তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর কোন বন্ধু জিজ্ঞেস করেন, আপনি তাকে কেন ছেড়ে দিলেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমি যখন তার কাছে যাই তখন তার মুখ থেকে এমন একটি বাক্য নিগত হয়, যাতে আমি বুঝে যাই- সে পুরুষ নয় বরং মহিলা। সেই বন্ধু বলেন, যা-ই হোক, সে তো অন্য সৈন্যদের ন্যায় যুদ্ধ করছিল, তবুও কেন আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন? আবু দুজানাহ্ (রা.) বলেন, আমার কাছে এটি অসহনীয় ছিল যে, আমি মহানবী (সা.)-এর তরবারি এক দুর্বল মহিলার পর চালাব– এটি আমার মন মানতে চাইছিল না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো বলেন, মোটকথা, মহানবী (সা.) সর্বদা মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতেন, যে কারণে কাফের মহিলারা খুবই ধৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতো কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানরা তা সহ্য করতেন। **(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২১-৪২২)**

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ স্যার উইলিয়াম মুইর আবু দুজানাহ্ (রা.) সম্পর্কে লিখেন, **যুদ্ধের সূচনাতেই মুহাম্মদ (সা.) তাঁর তরবারি হাতে নেন এবং বলেন কে আছে যে এর প্রতি সুবিচারের শর্তে এই তরবারি নিবে? উমর, যুবায়ের এবং আরো অনেক সাহাবী এটি নেওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে দিতে অস্বীকৃতি জানান। সবশেষে যখন আবু দুজানাহ্ আবেদন করেন তখন মুহাম্মদ (সা.) তাকে এটি প্রদান করেন এবং তিনি এটি দিয়ে কাফিরদের শিরোচ্ছেদ করতে আরম্ভ করেন।** **(Life of Mohamet by Sir William Muir, Pg. 269, Smith Elder & Co. Waterloo Place London, 1878)**)

তারপর তিনি লিখেন, **"মুসলমানদের সাঁড়াশি আক্রমনের সামনে মক্কা বাহিনীর পা দোদুল্যমান হতে দেখা যায়। কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনী পেছন থেকে এসে কয়েকবার ইসলামী সেনাদলের বাম দিক দিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করে কিন্তু প্রত্যেক বারই তাদের সেই ৫০জন তিরন্দাজের তিরের আঘাতে পিছিয়ে যেতে হতো যাদেরকে মুহাম্মদ (সা.) বিশেষ ভাবে সেখানে নিযুক্ত করেছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে উহুদের ময়দানেও একই ধরনের সাহসিকতা, পৌরুষ আর মৃত্যু ও বিপদের প্রতি সেই ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করা হয়েছে যা তারা বদরের যুদ্ধের সময় দেখিয়েছিল। নিজের শিরস্ত্রাণে লাল রুমাল বেঁধে আবু দুজানাহ্**

(রা.) যখন কুরাইশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ করেন তখন মক্কাবাহিনীর সারিতে বারবার ফাটল দেখা দিতে থাকে। মুহাম্মদ (সা.) তাকে যে তরবারি দিয়েছিলেন সেই তরবারি দিয়ে চতুর্দিকে তিনি মৃত্যুপুরী রচনা করছিলেন। হামযাহ্ (রা.)-কে নিজের মাথায় উট পাখির পালক পরিহিত অবস্থায় সর্বত্র স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। আলী (রা.) তার লম্বা এবং সাদা পতাকা নিয়ে এবং যুবায়ের (রা.) তার উজ্জ্বল হলুদ রঙের পাগড়ী পরে ইলিয়ডের বীরদের ন্যায় যেখানেই যেতেন শত্রুদের জন্য মৃত্যু ও দুশ্চিন্তার বাণী বহন করে নিয়ে যেতেন। এটি সেই দৃশ্য যেখানে পরবর্তীতে ইসলামী বিজয়ের বীর সেনানীরা প্রশিক্ষণ পেয়েছে।" {সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৯০}

এখন আমি যা পড়লাম তা সীরাত খাতামান্ নাবীঈন (সা.) পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদ থেকে ফিরে এসে তাঁর মেয়ে ফাতেমা (রা.)-কে নিজের তরবারি দিয়ে বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! এটি ধুয়ে রক্ত পরিস্কার করে দাও। হযরত আলী (রা.)ও নিজের তরবারিটি তাকে (অর্থাৎ হযরত ফাতেমাকে) দেন এবং বলেন, এটিও ধুয়ে রক্ত পরিস্কার করে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! এটি আজ বিশ্বস্ততার সাথে আমায় সঙ্গ দিয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি যদি যুদ্ধে তোমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে থাকো, তাহলে নিশ্চয় সাহ্‌ল বিন হুনায়ফ ও আবু দুজানাহ্‌ও যুদ্ধে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। একটি বর্ণনায় সাহ্‌ল বিন হুনায়ফের পরিবর্তে হারেস বিন সিম্মা (রা.)'র নামও এসেছে। **(উসদুল গাবাহ্ ফি মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০, আবু দুজানাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

যায়েদ বিন আসলাম বর্ণনা করেন, হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র অসুস্থাবস্থায় লোকেরা তাকে দেখার জন্য আসে, (সে সময়ও) তার চেহারা ঝলমল করছিল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার চেহারার ঔজ্জ্বল্যের কারণ কী? এর উত্তরে হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) বলেন, আমার কর্মগুলোর মধ্যে এমন দু'টি কর্ম রয়েছে যা আমার নিকট অনেক বেশি ভারী এবং পরিপক্ক। প্রথমটি হল, আমি কখনো এমন কথা বলি না যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার হৃদয় মুসলমানদের জন্য সর্বদা পরিষ্কার থাকে। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০, আবু দুজানাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুসায়লামা কায্‌যাব যখন মিথ্যা নবুয়তের দাবী করে মদীনার বিরুদ্ধে সেনাভিযানের ষড়যন্ত্র করে তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দমনের লক্ষ্যে দ্বাদশ হিজরীতে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)ও সেই সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। 'বনু হুনায়ফা' (একটি প্রাচীন আরব গোত্রের একটি বড় অংশ মুসায়লামা কায্‌যাবের নেতৃত্বে মদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল), ইয়ামামায় তাদের একটি বাগান ছিল, যাতে পরিবেষ্টিত অবস্থায় তারা যুদ্ধ করছিল। মুসলমানরা তাতে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছিল না। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) মুসলমানদের বলেন, 'আমাকে বাগানের ভেতরে নিক্ষেপ কর', মুসলমানরা তাই করে। কিন্তু উল্টো দিকে পড়ে যাওয়ার কারণে তার পা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এরপরও তিনি বাগানের ফটকের নিকট লড়তে থাকেন এবং মুশরিকদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দেন আর মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করে। হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ এবং ওয়াহশী বিন হারবের সাথে মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যায় অংশ

নেন। ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তিনি শাহাদত বরণ করেন। **(উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত), (আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতি আল্ আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৯, আবু দুজানাহ্ আল্ আনসারী, বৈরুতের দারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০, আবু দুজানাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত), (দায়েরায়ে মু'য়ারেফ ইসলামিয়্যাহ্, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯৫, উর্দ বিভাগ লাহোর)**

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.) সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)'র পক্ষে যুদ্ধ করে মারা গিয়েছিলেন; কিন্তু এটি দুর্বল রেওয়ায়েত, প্রথমটি বেশি সঠিক এবং অধিকহারে বর্ণিত হয়েছে। **(উসদুল গাবাহ্ ফী মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮, সিমাক বিন খারাশাহ্, বৈরুতের দারুল্ ফিকর থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)**

(পরের কথাটি) আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি এখানেও কিছু অংশ বর্ণনা করছি কেননা, হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)'র সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আবু দুজানাহ্ (রা.) আনসারী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে (তিনি) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও মহানবী (সা.)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরল সম্মান লাভ করেছেন এবং অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন; একইভাবে তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণের সুযোগ পান এবং যুদ্ধের পট পরিবর্তনের পরে অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানরা বিজয় লাভ করছিল; এরপর পট পরিবর্তন হয় এবং একটি স্থান পরিত্যাগের কারণে কাফিররা পুনরায় আক্রমণ করে আর যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলে যায়। সে সময় যেসব সাহাবী মহানবী (সা.)-এর পাশে ছিলেন তাদের মাঝে হযরত আবু দুজানাহ্ (রা.)ও ছিলেন। আর মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তায় তিনি গুরুতর আহত হন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পিছপা হন নি। একবার অসুস্থতাবস্থায় নিজের একজন সঙ্গীকে বলেন, হয়তো আমার দু'টি কর্ম আল্লাহ্ তা'লার নিকট গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে। একটি হল, আমি বৃথা কথা বলি না, পরচর্চা করি না; লোকদের পিছনে তাদের কুৎসা করি না। দ্বিতীয়ত, কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে আমার মনে কোন ঘৃণা ও বিদ্বেষ নেই। **(১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখের জুমুআর খুতবা, সুত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬-১২ এপ্রিল, ২০১৮, ২৫তম খণ্ড, ১৪তম সংখ্যা, পৃঃ ৫)**

এখানেই তার স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হচ্ছে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব আর তাদের গায়েবানা জানাযার নামাযও পড়াবো। তাদের মাঝে একজন শহীদও রয়েছেন যাকে সম্প্রতি শহীদ করা হয়েছে। তিনি হলেন, পেশাওয়ার জেলার সৈয়্যদ জালাল সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় মাহবুব খান সাহেব। মাহবুব খান সাহেবকে আহমদী বিরোধীরা ৮ নভেম্বর, ২০২০ ইং সকাল আটটায় পেশাওয়ারের শেখ মোহাম্মদী গ্রামে গুলি করে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

বিস্তারিত বিবরণ হল, মাহবুব খান সাহেব ৬ নভেম্বর পেশাওয়ারের খুশহাল টাউন থেকে নিজ দৌহিত্রীর সাথে দেখা করতে যান যে নিজের পরিবারসহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম শেখ মুহাম্মদীতে বসবাস করে। ৮ নভেম্বর ফেরত আসার জন্য বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে বাসস্ট্যান্ডের নিকটে পৌঁছালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি পিছু নিয়ে তাকে গুলি করে। একটি গুলি পিছন থেকে মাথায় লাগে এবং সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়; যার ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার পর ঘাতক পালিয়ে যায়। শহীদ মরহুমের বয়স ছিল প্রায় ৮০ বছর। মরহুম পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট থেকে ২০০২ সালে অফিসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে অবসর গ্রহণের পর পেনশনার হিসেবে জীবন যাপন

করছিলেন। মরহুমের পিতা সৈয়্যদ জালাল সাহেব ১৯৩০ এর দশকে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। শহীদ মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন।

মরহুম অসংখ্য গুণের অধিকারী ছিলেন। তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। ভদ্রতা, সহানুভূতি এবং অতিথিসেবা ছাড়াও দানশীলতায় অভ্যস্ত ছিলেন। তবলীগের আগ্রহ উন্মাদনার পর্যায়ে ছিল। তবলীগের জন্য সদা সোচ্চার থাকতেন। যখনই তাকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হত তার বক্তব্য হত; এখন তো এমনিতেই খোদার দরবারে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে; যদি শাহাদত বরণ করতে পারি তাহলে এটি আমার সৌভাগ্য হবে। তার শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হয়েছে। শহীদ মাহবুব খান সাহেবের স্ত্রী মি'রাজ বেগম সাহেবার স্বতন্ত্র মর্যাদা হল, তার পিতা মুহাম্মদ সাঈদ সাহেব এবং চাচা বশীর আহমদ সাহেব ১৯৬৬ সালে শহীদ হয়েছিলেন আর এ সৌভাগ্য এখন তার স্বামী লাভ করেছেন। এভাবে তিনি একজন শহীদের কন্যা, শহীদের ভাতিজী এবং একজন শহীদের স্ত্রীও।

মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে রয়েছেন, তার স্ত্রী মোহতরমা মি'রাজ বেগম সাহেবা, দুই ছেলে মনোয়ার সাহেব এবং ফযল আহমদ সাহেব, দুই মেয়ে যাকিয়া বেগম সাহেবা ও ওয়াহীদা বেগম সাহেবা। এছাড়া দু'জন পৌত্র, একজন পৌত্রী আর ছয়জন দৌহিত্র ও চারজন দৌহিত্রী রয়েছে। তার ছোট ছেলে মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি করেছেন। তিনি বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় আছেন আর অপরজন ফযল আহমদ সাহেবও সুশিক্ষিত আর ইংরেজিতে এমএ করেছেন; তিনি জার্মানীতে বসবাস করেন।

তার ছেলে মনোয়ার আহমদ খান সাহেব বলেন, মাহবুব খান সাহেব নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বদা সোচ্চার থাকতেন। কখনো কখনো দুই বিবদমান দলের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে রক্তপণও দিয়ে দিতেন। গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তার কাছে আসতো এবং তিনি তাদের সাহায্যের জন্য সবসময় কিছু না কিছু নগদ অর্থ এবং খাদ্যশস্য মওজুদ রাখতেন। অতিশয় নম্র ও নীরব স্বভাবের মানুষ ছিলেন। পরম ধৈর্যশীল এবং অন্যের কষ্টের প্রতি সংবেদশীল আর তাদের সাহায্যের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকেও তার সৎকর্মগুলোকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা পাকিস্তান নিবাসী মুরব্বী সিলসিলাহ্ ফখর আহমদ ফররখ সাহেবের। ১লা নভেম্বর, ২০২০ তারিখ সন্ধ্যা সোয়া ছ'টার সময় তিনি তার ছেলে এহতেশাম আব্দুল্লাহ্‌র সাথে আহমদনগর থেকে ফেরার পথে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। খুবই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ছিল, পিতা পুত্র উভয়ই ঘটনাস্থলেই মারা যান, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

আল্লাহ তা'লার কৃপায় ফখর সাহেব মূসী ছিলেন। ফখর সাহেবের পিতা সাইফুর রহমান সাহেব নিজে বয়আত করেছিলেন। তার পরিবারে এর পূর্বে আর কোন আহমদী ছিল না। ১৯৬৮ সনে তিনি বয়আত করেন আর এভাবে তিনি তার বংশের প্রথম আহমদী হন। ফখর সাহেব ১৯৯৬ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে উত্তীর্ণ হবার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সেবা করার সৌভাগ্য পান। এরপর তাকে পশ্চিম আফিকার আইভরিকোস্টে পাঠানো হয়। এরপর গত আট বছর ধরে তিনি পাকিস্তানের আহমদনগরে মুরব্বী সিলসিলাহ্

হিসাবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছিলেন। আলী আসগর সাহেবের কন্যা তাহেরা ফখর সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের চার মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান এহতেশাম আব্দুল্লাহ্ ছিল, যে পিতার সাথে এই দুর্ঘটনাতেই মারা যায় এখন শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ও চার কন্যা রয়েছে এছাড়া রয়েছেন তার মা ও ভাই বোন। তার মেয়েরা হল, স্নেহের ওয়াজীহা আমাতুস্ সুবূহ্, খাফিয়া ফখর, সামারীন ফখর এবং মেহরীন ফখর।

ফখর সাহেবের স্ত্রী তাহেরা সাহেবা লিখেন, আমাদের যখন বিয়ে হয় তখন মুরব্বী সাহেবের পোস্টিং ছিল খোশাবের একটি গ্রামে অর্থাৎ সেখানে তিনি কর্মরত ছিলেন। আমি যখন সেই সেন্টারে যাই তিনি আমাকে একজন মুরব্বীর স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলেন এবং আমাকে বুঝান, এখন তুমিও আমার সাথে ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী, তোমাকেও জামাতের সেবায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত। এভাবে তিনি তরবীয়ত করেছেন। এরপর বদীনে তার বদলি হয়। মুরব্বী সাহেব প্রথমে চলে যান, ইনি (অর্থাৎ তার স্ত্রী) কিছুদিন পর তার সাথে যোগ দেন। তিনি বলেন, যেদিন আমি সেখানে যাই– যাবার পূর্বে আমি তাকে অবগতও করেছিলাম কিন্তু সেখানে যাবার পর দেখি মুরব্বী সাহেব সেন্টারে নেই, আমি মসজিদের বাইরে রোদের মধ্যে বসে থাকি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি কোন মুয়াল্লিম সাহেবের অসুস্থ স্ত্রীর রক্তের প্রয়োজন ছিল তাই মুরব্বী সাহেব তাকে রক্ত দেয়ার জন্য গেছেন। ফিরে আসার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, সারাদিন আমি রোদে বসে আছি অথচ আপনি জানতেন যে, আমি দীর্ঘ সফর করে আসছি। তিনি উত্তরে বলেন, সেই কাজটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর আমাকে বুঝান, এভাবেই ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

তিনি যখন আইভরিকোস্টে যান, সেখানেও ধর্মের কাজের পাশাপাশি মানব সেবামূলক অনেক কাজ করেন। সর্বদা স্ত্রী-সন্তানদের ওপর ধর্মকে অগ্রগণ্য রেখেছেন। তার স্ত্রী বলেন, আমার কন্যার জন্মের সময় একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। মুরব্বী সাহেব 'মেডিকেল শিবির' এর কাজে গিয়েছিলেন। ডাক্তার আমার অবস্থা আশঙ্কাজনক বললেও মুরব্বী সাহেব আমাকে রেখে চলে যান। যাওয়ার পূর্বে শুধু এতটুকু বলে যান, আল্লাহ কৃপা করবেন, তুমি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর স্ত্রী, তোমার কিছুই হবে না। মোটকথা মুরুব্বী সাহেব প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অতিথিসেবা, সৃষ্টিসেবা ও ধর্মসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। আপন-পর সবাইকে ভালোবাসতেন। সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কোন সমস্যা তা পারিবারিক হোক বা আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, জামাতী হোক কিংবা অ-আহমদী বন্ধুদেরই হোক না কেন (সকল ক্ষেত্রে) তিনি খুবই সুন্দরভাবে বুঝাতেন। নিজ সন্তানদেরও বুঝাতেন, তোমরা ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী ও এক মুরুব্বীর সন্তান তাই সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে এবং নিজেদের উত্তম আদর্শ স্থাপন করবে।

আইভরিকোস্টের মুরুব্বী বাসেত সাহেব বলেন, ফখর সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে আইভরিকোস্টে আসেন। তিনি খুবই মিশুক, হাস্যোজ্জ্বল এবং পুণ্য স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। মনোমুগ্ধকর বাচনভঙ্গি ছিল তার ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিক। যার সাথেই মিশতেন সে তার ভক্ত হয়ে যেতো। পাঁচ বছর 'অওমে' রিজিওনে মুবাল্লিগ হিসেবে সেবা করেছেন। তার উত্তম চরিত্র ও সহমর্মিতার কারণে ছোট বড় সবাই তার সাথে সুসম্পর্ক রাখত এবং সর্বদা তার কথা স্বরণ করে। জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন কোন দরিদ্র আহমদীকে গোপনে যাতায়াত খরচ প্রদান করতেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে তার রিজিওন উপস্থিতির দিক দিয়ে সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করত। সেখানকার স্থানীয় মুয়াল্লিম সোমারো হারুন সাহেব বলেন, আড়াই বছর আমি তার সাথে কাজ করেছি। নিজের ভাইয়ের মত তিনি আমার খেয়াল রেখেছেন। যে বিষয়টি বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করেছি তা হল, খুবই পরিশ্রমী ও উদ্যমী মুবাল্লিগ ছিলেন। প্রতিটি কাজ দায়িত্বশীলতার সাথে ও নিমগ্নচিত্তে করতেন। দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার এক উন্মাদনা ছিল তা তবলীগের কাজ হোক কিংবা চাঁদা তোলার কাজ কিংবা জলসা সালানার প্রস্তুতিমূলক কাজই হোক না কেন। তবলীগের প্রেরণা এমন ছিল যে, তিনি চাইতেন যতদ্রুত সম্ভব প্রতিটি গ্রামে যেন জামাতের বাণী পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার মেয়েদের ও স্ত্রীর সুরক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হোন আর সব ধরণের অনাগত দুশ্চিন্তা ও বিপদাবলী থেকে তাদের রক্ষা করুন।

তৃতীয় জানাযা মুরুব্বী ফখর আহমদ ফর্‌রখ সাহেবের পুত্র এহতেশাম আহমদ আব্দুল্লাহ্‌র। যেমনটি আমি বলেছি, সেও তার পিতার সাথে সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওয়াক্‌ফে নও এর কল্যাণময় স্কীমে অন্তর্ভুক্ত ছিল। উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। সে মূসী না হলেও ওসীয়্যত ফরম পূরণ করেছিল, এখনো জমা দেয়নি। যাহোক, যদি ফরম পূরণ করা থাকে তাহলে কারপরদায এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে পারে। তার মা বলেন, আমার পুত্র অনেক গুণের অধিকারী ছিল। নেক, পুণ্যবান এবং অনুগত ছিল। ওয়াক্‌ফে নও এর তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিয়মিত নামাযে অভ্যস্ত ছিল। খোদ্দামুল আহমদীয়ার যয়ীম সাহেবের সকল আদেশ পালন করত এবং ডিউটি ইত্যাদি অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করত আর যেদিন মারা যায় সেদিনও মসজিদে ডিউটি দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা রাবওয়ার মিয়াঁ আব্দুল লতীফ সাহেবের পুত্র মুকাররম ডক্টর আব্দুল করীম সাহেবের যিনি স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর, ৯২ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব (রা.)'র পৌত্র ছিলেন। কাদিয়ানের তা'লীমুল ইসলাম কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী

ছিলেন। দেশ বিভাগের পর যখন কলেজ লাহোরে স্থানান্তরিত হয় তখন তা'লীমুল ইসলাম কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ করেন। তখন গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই তা'লীমুল ইসলাম কলেজের একমাত্র শিক্ষার্থী ছিলেন। পরবর্তীতে স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি করার মানসে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে তিনি মসজিদ ফযলে থাকতেন এবং অবসর সময়ে তবলীগি কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকতেন। পাকিস্তানের প্রতি ডক্টর সাহেবের সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি তার পেশাগত জীবনে বিশ্ব ব্যাংক এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থায়ীভাবে কাজ করা সত্ত্বেও সর্বদা পাকিস্তানে থেকে কাজ করাই পছন্দ করেছেন। দীর্ঘদিন স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তানে চাকরী করেন এবং উপদেষ্টার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নিজের যুগে তিনি IMF এবং এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের মত প্রতিষ্ঠানের সাথে অনেক দেশী ও বিদেশী এসাইনমেন্ট বা কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন। কিছুদিন অর্থ মন্ত্রণালয়েও কাজ করেছেন এবং একটি ফেডারেল বাজেটও তার তত্ত্বধানে প্রণীত হয়। IMF এর পক্ষ থেকে তাকে দু'বছরের জন্য সুদান সরকারের আর্থিক সমস্যাদি সমাধানের নিমিত্তে খার্তূমেও প্রেরণ করা হয়।

স্টেট ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি জামাতের সেবার মানসে রাবওয়ায় অবস্থান করাকে প্রাধান্য দেন। **'অর্থনীতি ও ধর্ম'** সংক্রান্ত বিষয়াদি সামনে এলে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হত। এ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠণ করা হয়েছিল, আমিও তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতাম। এ বিষয়ে বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন ভালো প্রবন্ধাদি লিখতেন। তাঁর প্রতিটি গবেষণা ছিল গভীর, তিনি এক্ষেত্রে বাস্তব বা ব্যবহারিক সমাধান উপস্থাপন করতেন। তার (প্রণীত) কয়েকটি গ্রন্থও রয়েছে যার মধ্যে ইংরেজিতে রয়েছে, **"ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি"**। **"ইসলামী ফিলসফায়ে হায়াত ও মুয়াশী উসূল"** এটিও ইংরেজী ভাষায় আর ঊর্দূ বইগুলো হল, **"হুরমত সূদ"** এবং **"হসূলে রিযক"**। ১৯৮৯ সনে অবসর গ্রহণের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র তাহরীকে ওয়াক্ফ করে তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ানোর উদ্দেশ্যে উযবেকিস্তান গমন করেন, সেখানে ছয়মাস সেবা প্রদান করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) **'বন্ধক ও সুদ'** সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রতি প্রণিধান করার জন্য উলামা ও অভীজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন তিনি এর সদস্য ছিলেন আর এর একটি সাব-কমিটিও ছিল, তাতে আমিও কিছুদিন তার সাথে কাজ করেছি। যেমনটি আমি বলেছি, প্রতিটি বিষয়ের গভীরে অবগাহন করে সব কথা বলতেন এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতেন। সুদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাকেও তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছেন, সেগুলো খুবই ভালো প্রবন্ধ। এগুলোর প্রতি আরো প্রণিধান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। ভবিষ্যতে সুদভিত্তিক ব্যবস্থাপনার বিপরীতে যে ব্যবস্থাপনা হবে তাতে তার বিভিন্ন মতামতও যুক্ত করা যেতে পারে। আল্লাহ্

তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলোর ওপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪ ডিসেম্বর, ২০২০, পৃঃ ৫-১১)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)